ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 04. No. 01. August 2010

প্রদীপ্ত প্রকৃতিচেতনা : ছফার কথাসাহিত্য

পুরনজিত মহালদার*

সারসংক্ষেপ : আহমদ ছফার কথাসাহিত্যে প্রকৃতির রূপায়ণ হয়েছে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে। প্রকৃতির সাথে একাত্মতা বোধ করে তিনি বাস্তবতা আর কল্পনার সম্মিলন ঘটিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। আহমদ ছফার গল্প-উপন্যাসে বিধৃত প্রাকৃতিক অনুষঙ্গকে মানবজীবন থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। প্রকৃতি আর মানুষ তাঁর কথাসাহিত্যে একাকার হয়ে গিয়েছে।

প্রকৃতিলালিত মানব সমাজ কিভাবে প্রকৃতির ক্রীড়ানক হিসেবে অভাবে, দুঃখে, সাহসে, সংগ্রামে বেঁচে থাকে তার অসামান্য উপস্থাপন আহমদ ছফার প্রথম উপন্যাস *সূর্য তুমি সাথী*। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে প্রকৃতি আর মনুষ্যসৃষ্ট হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টিকে থাকার এক বাস্তব চালচিত্র *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাস। ষাটের দশকে পূর্ববাংলার অস্থির সময়-বিন্যাসে আহমদ ছফা পূর্ববাংলার প্রকৃত শেকড়-ভূমি গ্রামকে কেন্দ্র করে লোক-ঐতিহ্য, লোকজীবন ও গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে রচনা করেছেন এই উপন্যাস। প্রকৃতি সংশিণ্টষ্ট বিভিন্ন উপাদানকে মানুষের প্রবহমান জীবনধারার সমান্তরাল মনে করে এই উপন্যাসের বিষয়-বিন্যাস ও প্রকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তিনি। প্রকৃতির কাছে মানুষের অগাধ প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী বরগুইনির দু'পাড়ের মানুষ চেয়েছিল ঘরে ধান তোলার মাস অগ্রহায়ণে যেন বৃষ্টি না নামে। কারণ:

যদি বিষ্টি আগনত
মানুষ যায় মাগনত
(অগ্রহায়ণে যদি বৃষ্টি হয় মানুষ ভিক্ষে করতে বেরোয়।)[১]

অগ্রহায়ণে বৃষ্টি নামেনি, কিন্তু পরবর্তী ছয় মাসে 'আকাশ একবার করুণায় সজল হয়ে' না ওঠায় সূর্যের অসহনীয় তাপে কৃষকরা রবিশস্যের ফসল বাঁচিয়ে ঘরে তুলতে পারেনি। প্রকৃতির খেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে নেমে আসে দুর্দশা। তাই দেখা যায় 'মাঠে আগুন, গাছে আগুন, ফসলে আগুন, প্রকৃতির শিখাহীন নীরব প্রদাহের মতো মানুষের অন্তরে উদরেও আগুন, আগুনের কণা।'[২] প্রকৃতির কৃপণতা আর আধা-সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার শোষণে পর্যুদস্ত হয়ে তেলীপাড়ার তেজেন 'যুগ-যুগান্তরের উত্থান-পতনের সাক্ষী' বটগাছের ডালে দড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করে। আহমদ ছফা মানব জীবনের দুঃখ দুর্দশার সাক্ষী হিসেবে প্রকৃতির বটগাছকেই বেছে নিয়েছেন। মাটি সংলগ্ন মানুষের ঐতিহ্য ও ইতিহাস, উত্থান-পতন এবং শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাসের ধারক বাহক হিসেবে

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বটবৃক্ষকে আহমদ ছফা বিভিন্ন গ্রন্থে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। *একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা* (১৯৭৭) কাব্যগ্রন্থে আহমদ ছফা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের উপকরণ বটবৃক্ষকে প্রবীণ মনীষীবৃক্ষ এবং বৃদ্ধ পিতামহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উপন্যাসের নায়ক হাসিম বাঁশ কাটতে গিয়ে জখমী হয়ে বিছানায় শায়িত হয়। দীর্ঘ আটদিন পর বৃষ্টি থামায় এক পায়ে ভর দিয়ে হাসিম দাওয়ায় এসে বসে। বিকালের আকাশে সোনার বরণ রোদ দেখে অসুস্থ হাসিমের মনে আনন্দের হিলেণ্ঢাল বয়ে যায়। লেখকের বর্ণনায়:

> প্রকৃতির সঙ্গে মনের এ সংযোগ কতো সহজ, কতো স্বাভাবিক। মনে মনে এর একটা অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করে। এই যে আকাশ, এই যে গাছপালা। এই যে সূর্য কেমন প্রিয় বন্ধুর মতো তার সমগ্র সত্তা নিবিড় স্নেহের আবরণে পরম মমতায় আচ্ছাদিত করে রেখেছে।[৩]

হাসিমের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে সুখের ঠিকানা একমাত্র স্ত্রী সুফিয়ার কাছে। হাজারো নির্যাতন, বঞ্চনা, দারিদ্র আর দুঃশ্চিন্তার মাঝে সুফিয়ার অন্তরঙ্গতা তাঁর জীবনে বয়ে আনে একটুখানি সুখ। সুফিয়াকে একান্তে কাছে পেয়ে তাঁদের শিরায় শিরায় যে আনন্দ বয়ে যায় তা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই। সে ভাষা শুধু প্রকৃতির কাছেই জমা আছে। 'বাশের ফোঁকড় ফোঁকড় দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, আস্তে আস্তে শিরীষ গাছের উঁচু ডালটির আড়াল দিয়ে মেঘের বুক চিরে একফালি চাঁদ উঠেছে। গভীর রাতের ভেতর বুকের যেসব অতি গভীর কথা ভাষা পায় না, সে সকল কথাই যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে চাঁদের আলোতে।'[৪] আবার দুঃখের মুহূর্তগুলোতেও যেন প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ের ভাষা বোঝে। সুফিয়ার প্রসববেদনা উঠলে হাসিম কোনকিছু ভেবে পায় না। সুফিয়ার অসহনীয় কষ্ট দেখে হাসিমের চেতনায় অন্ধকার নেমে আসে। প্রকৃতির বুকেও নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। লেখকের ভাষায়:

> রাতের আকাশে তারাগুলো সব মরে গেছে। সমগ্র পৃথিবীকে আঁধার ভালুকের মতো চেপে ধরেছে ... ভূতুমের স্বর আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বাদুড়ের আওয়াজ মরে গেছে।[৫]

লেখক শুধু সুফিয়ার বেদনার সাথেই প্রকৃতির তুলনা করেননি। খলু মাতব্বর দারোগার কামনার আগুন নেভাতে নিজের ভাইঝি জোহরাকে জোরপূর্বক দারোগার ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয়। অন্ধকার রাতে খলু মাতব্বরের নির্মম চক্রান্তে ধর্ষিত জোহরার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। হাসিম খলু মাতব্বরের কর্মকাণ্ড দেখে মনে করে পৃথিবী, আকাশ-বাতাস সব কাঁপছে। বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে সে। 'নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো। তার দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই আধখানা সোনার থালার মতো সুন্দর চাঁদ ডুবে গেলো। চরাচরের জীবন্ত পীচের মতো অন্ধকার।'[৬] প্রকৃতির এই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যেই ঢলে পড়ে নির্মমভাবে ধর্ষিতা জোহরা। *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসে আহমদ ছফা মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সাথে প্রকৃতিকে মিলিয়ে দিয়েছেন দক্ষতার সাথে।

দোলো আমার কনক চাঁপা (১৯৬৮) গ্রন্থের নাম গল্পে বালক আশুর ভাবনার মধ্য দিয়ে এসেছে প্রকৃতি। দুঃখ দারিদ্র্যের সংসারে কোন কিছুই না পাওয়ার বেদনায় আশু প্রকৃতির কাছে আসে। প্রকৃতিকে বোঝাতে চায়, বলতে চায় নিজের কষ্টের কথা, না পাওয়ার বেদনার কথা। শুধু তাই নয়, সেও শুনতে চায় প্রকৃতির গভীর গোপন কথা। 'ঢাকুল ঢাকুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে অন্ধকার আর ভেতরে অনেক কথা, অনেক কথা-চুপ করে আছে। আশু ভাবে, গাছেরা কথা কইতে পারলে বেশ হতো। অনেক মজার কথা। সুন্দর কথা, আজব কথা বলতে পারত। কত বছর পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ বিষ্টি রোদ্দুরের কত ছোয়া পেয়েছে। তার ভাষা নেই কেনো।'[৭] আশু মনে করে আকাশের বুকে, রোদ্দুরে, সমস্ড় গাছে, হেলেঞ্চার তাজা সবুজ ডগায় আর বাবুই পাখির ঝুলন্ড় বাসায় অনেক কথা জমা আছে। তাদের ভাষা সে বুঝতে পারে না বলে দুঃখ হয়। তাই তাদের ভাষা বোঝার জন্য আশু ভাবে:

> আমি ফড়িঙ হলাম না কেন। কেন হলাম না কনক চাঁপার একটা হলুদ গুচ্ছ। হলুদ বরণ বুক ভিজে ভিজে গন্ধে থাকত ভরে।[৮]

আবার পরমুহূর্তে আশু ভাবে এই সুন্দর গাছপালা যাদের সাথে তাঁর মনের মিলন ঘটে তারা সবদিন থাকবে না। 'আশু মনে মনে চিন্ড়া করে উপকারী গাছগুলোর মাথায় কেন বাজ পড়ে। ভুবন ডাক্তারের মতো ভাল মানুষেরা কেন তাড়াতাড়ি মরে যায়। কেউ তার জবাব জানে না।'[৯] প্রকৃতির অকৃত্রিম দানের সাথে লেখক এখানে মানবপ্রেমিক মানুষের তুলনা করে প্রকৃতি ও মানুষের সত্তাকে একীভূত করে তুলেছেন।

দুটি মর্মর মূর্তির কাহিনী গল্পে দেখা যায় কৃষিকাজে একটা বিপণ্ডব আনতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রাহমান সাহেবের নিরলস গবেষণা। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট টাইটেল পাওয়া রাহমান সাহেব হাতেকলমে কৃষি কাজে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ শিক্ষা করে দেশে এসে পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি খামার গড়েছেন। শহরের রাস্ড়া থেকে ছিন্নমূল ছেলেদের কুড়িয়ে এনে আদর্শ কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তিনি। উদ্দেশ্য অভাব, অজ্ঞানতা দূর করা। পূর্ব আকাশে সূর্য জাগার সাথে সাথে বিজ্ঞানী আর তাঁর ছেলেদের ফুল ফোটাবার সাধনা শুর হয়। রাহমান সাহেবের খামারে ছেলেরা গান গায় এক সুরে:

> ওগো বীজ তোমায় ডাকি
> মেলো তোমার সবুজ আখি
> ... ...
> ফুল কলি সব কথা শোনো
> কেন মিছে সময় গোনো
> কচি বুকের কুসুম তাপে।
> রাঙ্গা ফুল ফুটোরে
> আমরা ফুল ফুটাইরে।[১০]

ছেলেদের গানের সুরে বীজ অঙ্কুরিত হয়, গাছে ফুল ফোটে। কঠিন মাটির বুক মমতায় মধুর হয়। সারারাত ধরে গবেষণায় থাকা অভুক্ত রাহমান সাহেবকে ছেলেরা খাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি বলেন: 'সে পরে হবে ক্ষন । আগে গাছপালাকে খাওয়াই। পরে

নিজে খাব।'[১১] রাহমান সাহেবের কথার মধ্যে দিয়ে আহমদ ছফা গাছকে জীবন্ড় সত্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ককে আরো নিবিড় করতেই যেন এই আয়োজন। রাহমান সাহেব বলেন: 'সূর্যের মিতা সূর্যমুখীকে সূর্য ভুলে গেছে। তাই বলে আমরা ভুলব কেন। দাও বেচারির কলিগুলো ফুটিয়ে দাও। গোড়ায় মিক্‌চার দাও, ট্যাবলেট দাও। আর কলিগুলোতে আলতো হাতে ছড়িয়ে দাও সোনালি আলো।'[১২] প্রকৃতি আমাদের দু'হাত উজাড় করে দান করে। প্রকৃতির পরিচর্যা আর তার বিকাশ সাধনে রাহমান সাহেবের নিরন্ড়র সাধনা প্রকৃতির সাথে মানুষের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করার প্রত্যয় বহন করে।

নিহত নক্ষত্র (১৯৬৯) গ্রন্থের গন্ড়ব্য গল্পে প্রকৃতির কঠিনতার সাথে রস্ড়্ম আলীর দুঃসাহসের মিল দেখিয়েছেন লেখক। মৃত্যুপুরী রিজার্ভড ফরেস্টের ঠিকাদার জুমাখানের কুলির বাথান থেকে পালিয়ে আসে রস্ড়্ম আলী। দুর্গম পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে নিজের প্রচ ইচ্ছে শক্তির জোরে সে স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফেরত যেতে চায়। কিন্তু পাহাড়ি পথ অতিক্রম করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। রক্তাক্ত রস্ড়্মের পা টলে, শরীর কাঁপা শুর করে। 'অগ্নিকোণে কড় কড় করে একটা বাজ পড়লো। স্মৃতিরা সব মাকড়সার জালের নাহান কোথায় হারিয়ে গেলো। বাঁকা বিদ্যুতের আগুন ঝিকঝিক করে জ্বলে উঠলো। ... কিছুদূর গিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেলো। 'মাগো, মা', অস্ফুটে চিৎকার করলো। একটা নখ উল্টে গেছে। হাত দিয়ে দেখে ভেজা রক্ত ছুটছে।'[১৩] তবু রস্ড়্ম আলী এগিয়ে চলে। একবারও পেছনে তাকায় না। কারণ পেছন মানে ভয়, পেছন মানে মৃত্যু। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুর হয়। দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে আসে প্রবল বাতাস। মড় মড় শব্দে ভেঙে পড়ে গাছের ডাল। বজ্রের মুহুর্মুহু চিৎকার পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। তবু রস্ড়্ম পাহাড়ের কাছে নতি স্বীকার করে না। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে আওয়াজ:

> রস্ড়্ম হুঁশিয়ার, আলণ্ডাহও তোর লগে দুশমনি করতে আরম্ভ করেছে। তুই কিন্তু ঘাবড়াসনে।[১৪]

প্রাণশক্তির জোরে রস্ড়্ম আলী এগিয়ে যায় তাঁর গন্ড়ব্যের দিকে। হামাগুড়ি দিতে দিতে লোকালয়ের কাছে এসে পৌছায়। বিজয়ী রস্ড়্ম আলীর মুখে দেখা দেয় একটুখানি প্রসন্ন হাসি। লেখকের বর্ণনায়:

> বনের ভেতরে বাঙ দিলো বন মোরগ। বাঙ তো নয়। পাখির কণ্ঠস্বর কেমন মু কাটা তলোয়ার হয়ে রাতের লোমশ শরীরে আঘাত হানে। মোরগের রক্ত ছলকানো আহবানের সঙ্গে তার রক্তিম হৃদয়ের মিল আছে। উভয়েই দুঃসাহসী।[১৫]

গন্ড়ব্য গল্পে রস্ড়্মের গন্ড়ব্য পথ প্রকৃতির প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ। তবুও রস্ড়্ম আলী হার মানেনি। প্রকৃতির ভীষণতার সাথে তাঁর অপরিসীম সাহস আর প্রচেষ্টা মিলেমিশে গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

আহমদ ছফার সর্বশেষ উপন্যাস *পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গপুরাণ* (১৯৯৬) প্রকৃতিনির্ভর রচনা। কিন্তু তাঁর এ প্রকৃতি নিশ্চল-নিথর নয়। এ প্রকৃতি প্রাণ সত্তাসম্পন্ন, আর নিয়ত সচল। প্রকৃতিকে মানবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিবেচনা করে লেখক এই উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। পাশাপাশি নিসর্গের ভেতর দিয়ে পরিভ্রমণ করে ঔপন্যাসিক আত্মসন্ধান

করেন এবং নিজের অস্তিত্বের মধ্যে আবিষ্কার করেন বিশ্বপ্রাণের অস্তিত্ব। কথক বলেন: 'এই বারান্দার ছাদটিতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে আমি ঈশ্বরের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছি। ... এখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবী দেখতে গেলে আমার নিজের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আবার নিজেকে দেখতে গেলে পৃথিবীর সঙ্গে মুলাকাত ঘটে।'[১৬] বাড়ি বদলের ব্যাপারকে কথক নতুন জন্ম মনে করেছেন। নতুন বাড়ির ছাঁদে দাঁড়িয়ে প্রসারিত আকাশ, প্রকৃতির বৃক্ষ এবং অসংখ্য পাখির চলমানতার সাথে কথক আত্মঅস্তিত্বের সংযোগ উপলব্ধি করেন। এই আত্মবোধকে তিনি নতুন জন্ম বলে অভিহিত করেছেন। কথক মনে করেছেন তাঁর বন্ধনমুক্তি ঘটেছে এবং মানসিক বিকাশের মাধ্যমে তিনি যেন ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে এসেছেন।

আহমদ ছফা বলেছেন: 'আকাশে আমি আমাকেই দেখি। জেন বুড্ডিজম বলে একটা জিনিস আছে জাপানে। এখন পৃথিবীতে সব জায়গায় খুব ছড়াচ্ছে। সেটার অর্থ হচ্ছে আকাশ-পাতাল ভূমণ্ডল সব জায়গায় নিজের একটা ছবি কল্পনা করা। এটা হচ্ছে জেন বুড্ডিজমের এসেন্স। অর্থাৎ আমি যদি যা-ই কিছু দেখি, যা কিছু করি, সেটা আমাকেই দেখি। আমাকে না দেখলে আমি আকাশের মধ্যে মজা পাবো কোথায়'?[১৭] উপন্যাসের কথকও নিজেকে দেখার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উপলব্ধি করেন। উপন্যাসের কথকের মধ্যে আহমদ ছফার ছায়া লক্ষ করা যায়।

ঊনিশশো তিরানব্বই সালের আগস্ট মাসে লেখক বাসা বদল করেছেন এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের আখ্যান শুরু, কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি উদ্ভিদ জগতের পুষ্প, বৃক্ষ এবং প্রাণিজগতের বিহঙ্গের সাথে মানবজগতের অন্তর্গত সম্পর্কগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছেন। পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গের সাথে লেখকের মানব জীবনের আন্তঃসম্পর্কের পর্যবেক্ষণশক্তির তীক্ষ্ণতায় চেনা-জানা জিনিসের মধ্যেও অন্যতম দর্শন উদ্ভাসিত হতে থাকে। নতুন বাসার ছাঁদে কথকের পালিত-পুত্র সুশীল একটি মৃতপ্রায় তুলসি চারা এবং তিনটি মুমূর্ষু নয়ন-তারার চারা খুজে পায়। সুশীল এবং কথকের যৌথ প্রয়াসে চারাগুলো নতুন প্রাণ পায়। নয়ন-তারার আশ্চর্য প্রাণশক্তি দেখে কথক অভিভূত হয়ে যান। তুলসি এবং নয়ন-তারার ফুল ফোটার মধ্যে কথক জীবন-সংগ্রামে বিজয়ের আভাস পান। প্রকৃতির প্রাণশক্তি দেখে জীবনের প্রতি কথকের আস্থা এবং বিশ্বাস ফিরে আসে। তুলসি এবং নয়ন-তারার ফুল ফোটা প্রসঙ্গে কথক বলেছেন:

> প্রতিদিন কত ফুলই তো দেখি। তুলসি এবং নয়নতারার ফুল দেখে প্রাণে যে হিলেণ্ডাল জাগে, অন্যফুলে তেমন হয় না কেন? বোধহয় প্রাণের সঙ্গে সংযোগটি স্থাপিত হয়নি বলে।[১৮]

তুলসি এবং নয়ন-তারার ফুল কথকের প্রাণ-শক্তি বৃদ্ধি করে। এই পুষ্প ও পুষ্পবৃক্ষ কথকের কাছে তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন ও শক্তি বলে প্রতিভাত হয়। তাঁর 'ভেতরে কে যেন বলে যেতে থাকে তোমার জীবনে দুঃখ-কষ্ট যাই আসুক, তুমি ভেঙে পড়বে না। একসময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ তুমি পাবে। নীরবে তুমি কাজ করে যাও, ফুলের বাবার সাধ্যি নেই, না ফুঠে থাকতে পারে।'[১৯] নীরবে সাধনা করে গেলে মানুষের

আত্মবিশ্বাস আর সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকশিত হবেই হবে, এ কথাই লেখক ফুল ফোঁটার প্রতীকী তাৎপর্যে বুঝিয়েছেন।

কথকের এই প্রত্যয়বোধ, আত্মশক্তির উদ্বোধনী মন্ত্র প্রকৃতির অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ায় এই উপন্যাস বিশ্বমানের হয়ে উঠেছে। আহমদ ছফা নিজেই বলেছেন: 'বিশ্বমানের কোন কোন লেখা আমার ওঠেছে, ফিল করি, আমার পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গপুরাণ বিশ্বমানের।'[২০] প্রকৃতি শুধু কথকের কাছে আত্মানুভূতি আর সৌন্দর্যানুভূতির মধ্যেই সীমায়িত নয়, প্রকৃতির মধ্যে তিনি সন্ধান করেছেন প্রাণসত্তার অমোঘ মন্ত্র। কথক তুলসি এবং নয়ন-তারার মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা খুঁজে পেয়েছেন। কারণ তারা জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে, তাই ফুল ফোটানোর মধ্যেও রয়েছে তাদের সাদৃশ্য। 'নয়নতারা গাছগুলোতে যখন ছোট ছোট কুড়ি এল, তখনই তুলসি গাছটি পুষ্পবতী হয়ে উঠল। তুলসি গাছে যখন বীজ ধরল, নয়নতারা গাছের শিয়রেও বীজ ভর্তি ক্যাপসুলগুলো দুলতে আরম্ভ করল।'[২১] তুলসি এবং নয়নতারার মধ্যে এই সমঝোতার ভাব মানবের মাঝে সাম্য সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। শুধু তাই নয় কথক মনে করেছেন সুশীলের আনা কুলিন পুষ্প গোলাপের আগমনে হয়ত নয়নতারা আর তুলসি ব্যথা পাবে। কিন্তু দেখা যায় তারা ব্যথা না পেয়ে সৎ প্রতিবেশীর মতো অবস্থান করতে থাকে। মানুষের মনের মতো ক্লেদ, কালিমা বৃক্ষের অন্তরে থাকে না। কথক তাই বলেন:

> আমার মনের কথাটিই তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। মানুষ সুবিধের জীব নয়। তারা নিজেদের মনের ময়লা কাদা এগুলো ফুলের শশীরে মাখিয়ে দিয়ে ভীষণ আনন্দ পায়।[২২]

পবিত্র ফুলের মধ্যে তাই কথক ঈশ্বরীয় সত্তা খুঁজে পান। ফুলের মধ্যেই নিহিত আছে ঈশ্বরে মাহাত্ম্য। 'আলণ্ডাহতায়ালা তাঁর গোপন বতেনি শক্তির একটা অংশ বৃক্ষ জীবনের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল করেছেন। এ কারণেই একদিন মানুষকে বৃক্ষের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মানুষ যদি বৃক্ষের শরণাগত না হয়, তার জীবনীশক্তিই জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।'[২৩] কথক তাই মানুষের হৃদস্পন্দনের সাথে বৃক্ষের সরল জীবনপ্রবাহের যে স্পন্দন তাকে সমার্থক মনে করেছেন। শুধু পার্থক্য চলার শক্তির মধ্যে। তাই মানুষ বৃক্ষের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু সব মানুষ নয়। কথকের ভাষ্য মোতাবেক:

> একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে যেভাবে সম্পর্ক নির্মাণ করে, সেভাবে একজন মানুষ একটি বৃক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কোন মানুষ? যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেন, বৃক্ষেরও একটি জীবন্ত সত্তা রয়েছে অন্য যে কোনো প্রাণীর মতো।[২৪]

রূপনগরের ফ্ল্যাটে বাসকালে কথকের লাগানো আপেল চারার সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ শোনায় তার মনে যে বেদনার জন্ম নেয় তার প্রতি আপেল চারা সমবেদনা প্রকাশ করে। একজন হাতুড়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীর পরামর্শে তিনি আপেল গাছের গোড়া খুঁড়ে তাজা চুন দেন। এরপর তাকে কলকাতায় যেতে হয়। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন তাঁর আপেল চারার পাতা থেকে অশ্রুবিন্দুর মতো পানি ঝরছে। তিনি বলেছেন: 'একরাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমার আপেল শিশুটির

প্রতিটি পাতা থেকে টপ টপ করে পানি ঝরে পড়ছে। গাছটির চেহারা মলিন এবং বিবর্ণ। আমার মনটা ধক করে উঠল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি বুঝে নিলাম, আমার আপেল শিশুটির কোনো বিপদ ঘটেছে।'[২৫] বৃক্ষের সাথে মানুষের মনের যে সংযোগ, যে আদান-প্রদান তা উপর্যুক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বৃক্ষের প্রাণের অস্তিত্ব অনুধাবন নতুন নয়। প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে এর ধারাবাহিকতা। তাই লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কারে দেখা যায় বৃক্ষপূজা কিংবা বৃক্ষের প্রতি মানুষের ভালবাসা সম্পূর্ণ হৃদয়জাত। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের গবেষণায়ও বৃক্ষের প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার্য বিষয়। কিন্তু বৃক্ষের এই জীবন্ত সত্তাকে অনুভব করা এবং প্রকৃতির ফুল, গাছ এবং পাখির বেদনার সাথে মানবের বেদনাকে এক করে অনুধাবন করতে বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের যুক্তি সাহায্য করতে পারে না। তা একান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতি। এই ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গা থেকেই প্রকৃতির প্রতি লেখকের হৃদ্যতা উৎসারিত। বৃক্ষকে একান্ত আপন করে ভালবাসলে বৃক্ষও মানুষকে অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদান করে। এই কথাই আহমদ ছফা প্রকাশ করেছেন *পুষ্প, বৃক্ষ* এবং *বিহঙ্গপুরাণ* উপন্যাসে।

উনিশশো তিরানব্বই সালের আগস্ট মাসের ঘটনার বিবরণ শেষ করে কথক উনিশশো আশি সালের আগস্ট মাসের দিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন *গণকণ্ঠ* পত্রিকা বন্ধ হওয়ার উপক্রম দিয়ে। *গণকণ্ঠ* পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে কথক মনে করেছেন বিপণ্ঢবের সব সম্ভাবনা 'অতলে তলিয়ে গেল, আমার সাধ, আহ্লাদ, স্বপ্ন, বাসনা সব কিছু তার সঙ্গে ছারখার হয়ে গেল। আমি অস্তিত্বের সবকিছু আগামী বিপণ্ঢবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলাম। আজকে অনুভব করছি, আমি গায়ে গতরে তরুণ হলেও আমার ভেতরে বুড়ো মানুষের ইচ্ছে শক্তিও নেই। আমি হাটছি, কিন্তু কোনো গন্তব্য নেই সামনে।'[২৬] কিন্তু এখানেও তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে বৃক্ষ। *গণকণ্ঠ* অফিস থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হোস্টেলে ফেরার পথে কাঁটাবন নামাজ ঘরের সামনে তিনি একটি থেতলানো বেগুন চারা পান। এরপর মৃতপ্রায় বেগুন চারাকে বাঁচিয়ে রাখতে কথকের যে কী আপ্রাণ প্রচেষ্টা, অনেকটা মহাব্যাধি-আক্রান্ত শিশুকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনতে উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতার যে আপ্রাণ চেষ্টা তার সঙ্গে তুলনীয়। থেতলানো বেগুন চারাটিকে একরাতের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে দেখে কথকের হৃদয়ে তোলপাড় হয়ে গেল। কথকের ভাষ্য :

> এই থেতলানো বেগুনের চারা যদি উঠে দাঁড়াতে পারে, আমারও হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার সম্ভাবনার সব পথ এখনো বন্ধ হয়নি। আছে, এখনো আমার আছে। আমি আবার নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করতে পারি।[২৭]

জীবনের প্রতি আস্থা হারিয়ে অসহায় মুহূর্তে কথক বৃক্ষের সহজাত প্রাণশক্তির ভেতর আশ্রয় সন্ধান করেছেন এভাবে। একটি বেগুন চারা দিয়ে শুরু হওয়ার পর কথক নিজ হাতে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে আন্তর্জাতিক হোস্টেলের সামনের খোলা মাঠে বেগুনসহ ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, টমেটো প্রভৃতি সবজির চাষ করলেন। একে একে বাড়তে থাকে চাষাবাদের পরিধি। কারণ অনাবাদী জমি পড়ে থাকতে দেখে তাঁর বন্ধ্যা নারীর কথা মনে

হয়েছে। কথকের চাষাবাদের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে শাহানার ছেলে কোয়েল এবং নীনুসহ হলের ছাত্রেরা 'অবচেতন আবেগের নির্দেশে' এগিয়ে আসে। চারা লাগাতে সবার এগিয়ে আসার কারণ হিসেবে কথক বলেছেন:

> চারা লাগাবার একটি আলাদা আনন্দ আছে। মানুষ হয়ত সচেতনভাবে বুঝতে পারে না, কিন্তু অবচেতনে একটা অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে। চারা লাগানোর মধ্যে যে একটা অমল আনন্দ আছে। তার কারণ বোধকরি ওই যে তার সঙ্গে অমরতার একটা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত থাকে।[২৮]

কথকের লাগানো চারাগাছের শরীরে নীরবে একের পর এক পরিবর্তন সূচিত হয়। চারাগাছে নতুন শাখা, নতুন পাতা দেখে তাঁর হৃদয় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। চারাগাছের সবুজ রঙ তাঁর চেতনাকেও সবুজ রঙে রাঙিয়ে দেয়। প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চেতনায়ও যে নতুন কিছু সৃষ্টি হয় সে কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

জীবনের প্রতি আহমদ ছফার প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় অঙ্গীকারের ছাপ তাঁর চাষাবাদের কাজের মধ্য দিয়ে ফুঁটে উঠেছে। 'আন্দ্রে ম্যাকারেঙ্কোর *রোড টু লাইফ* (বাঁচতে শেখা) বইটি পড়ে বিপণ্ঢবোত্তর রাশিয়ার টোকাই ভবঘুরে এবং অনাথ এতিমদের শিক্ষাদান পদ্ধতির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পেরে আহমদ ছফা আমাদের চারপাশে অযত্ন-অবহেলায় লালিত শিশুদের নিয়ে ভাবতে শুরু করেন - একটা প্রচণ্ড অপরাধবোধ তাঁকে আবিষ্ট করে। *ইত্তেফাক* -এর নাজিমুদ্দিন মোস্তানকে সাথে নিয়ে তিনি তাঁর তখনকার আবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের পেছনের কাঁটাবন বস্তিতে ১৯৮০ সালে গড়ে তোলেন 'শিল্পী সুলতান শিক্ষালয়।'[২৯] উপন্যাসেও দেখা যায় কথকের বর্ণনায় এই ঘটনা উঠে এসেছে। লেখকের ভাষায়:

> চারাগাছের দুতিয়ালিতে মোস্তানের সঙ্গে আমার একটা হৃদ্যতা জন্মে গেল। কিছুদিনবাদে মোস্তান আমাকে তাঁর লেখা একটি কবিতার খাতা দিয়ে গেলেন। সেই সময়ে আমি আন্দ্রে ম্যাকারেঙ্কোর 'রোড টু লাইফ' বইটি পড়ি। ম্যাকারেঙ্কো রুশ শিক্ষাবিদ। তিনি বিপণ্ঢবোত্তর রাশিয়ার টোকাই ভবঘুরে এবং অনাথ এতিমদের শিক্ষা দেয়ার একটি সুন্দর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এ বইটা সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে লিখেছেন। বইটা পাঠ করার পর আমার শিরায় চঞ্চলতা খেলে যেতে লাগল। জীবনের আরো এক সম্প্রসারিত রূপ প্রত্যাশা করে ধমনীর রক্ত উজানে চলতে আরম্ভ করল। ভাঙা চোরা শিশুর মধ্যেও মহামানবের অঙ্কুর রয়েছে। মানুষ মাত্রই অমৃতের পুত্র একথা আগে কখনো এমন করে অনুভব করিনি।[৩০]

বস্তির শিশুদের মধ্যে 'মহামানবের' প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়ে নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে লেখক 'শিল্পী সুলতান শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুদের প্রতি ছিল লেখকের অপরিসীম মমতা। তাই ক্ষেতের প্রথম তরিতরকারি দিয়ে সুলতান স্কুলের বাচ্চাদের খাওয়ান তিনি। লেখকের মতে, তাঁর 'ফাঁকা এবং অর্থহীন' জীবনের মাঝে বস্তির শিশুরা আলোকিত হয়ে আছে। উপন্যাসে কথক বলেছেন: 'এই ক্ষেতের তরিতরকারি দিয়ে বস্তির শিশুদের একবেলা খাইয়েছিলাম সেই শিশুদের উৎফুল্ল মুখমণ্ডল, সেই উৎসবের অমল আনন্দের রেশ, আমার জীবনের প্রথম বীর্যপাত যেমন, প্রথম রমণী সঙ্গম যেমন, তেমনি আমার মনে উজ্জ্বল আয়ুষ্মান হয়ে টিকে আছে। চোখ বন্ধ করলেই সেই শিশুদের

হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পাই। তাদের কচি কণ্ঠের চিৎকার শ্রবণে জেগে উঠতে থাকে। তখন একটা অনুভূতি আমার মনে জেগে ওঠে। হয়ত আমার এই জীবনের সবটা একেবারে বিফলে যায়নি।'[৩১] জীবনের সাফল্যকে চিহ্নিত করার সাথে ফসল ফলানো, ছিন্নমূল শিশুদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও তাদের একবেলা খাওয়ানোর মধ্যে কথকের জীবনবোধের গভীরতা ও ব্যাপকতা উন্মোচিত হয়েছে।

কথকের অনুভবে- সবুজ উদ্ভিদের যে আত্মা রয়েছে তার স্পর্শ তাঁর নিজের আত্মায় এসে লাগে। উদ্ভিদের সেই আত্মার জোরেই তারা ভাল-মানুষ, মন্দ মানুষ চিনতে পারে। 'মন্দ মানুষ ক্ষেতে ঢুকলে, চারাগাছের শরীরে তাদের স্পর্শ লাগলে চারাগাছ অপরিসীম বেদনায় কাঁদে।'[৩২] দীর্ঘদিন ক্ষেতের চারা গাছের সহবাসে থেকে কথকের একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জন্ম নেয়, যা দিয়ে তিনি গাছের ভাষা অনুমান করতে পারেন বলে মনে করেছেন। গাছ যে প্রতিবাদ করে সে বিষয়ে আহমদ ছফা তাঁর শোনা কাহিনীর দ্বারা বর্ণনা করেছেন:

> এক ভদ্রলোক গাছের প্রতি খুব অনুরক্ত। একদিন সে গাছের স্পন্দনগুলো মাপছিলো। ওই যে ভাইব্রেশন। যখন মাপছিলো তখন চিংড়ি মাছ রান্না করছিলো। হঠাৎ করে দেখে যে গাছের ভাইব্রেশন বেড়ে গেছে। দেখা গেছে যে একটা চিংড়ি জীবন্ড় ছিলো। গাছ প্রতিবাদ করছে। গাছের তলায় যখন খুন হয়, গর" জবাই করে, গাছ তখন প্রতিবাদ করে।[৩৩]

কথকের সযত্ন প্রয়াসে বেড়ে ওঠা সবজি বাগানের বেগুন গাছে প্রথম ফুল আসায় তিনি আনন্দে, রোমাঞ্চে উদ্বেলিত হয়েছেন। কথক এই 'অসহ্য আনন্দের' ভাব সইতে না পেরে, কারো কাছে প্রকাশ করতে না পেরে অগত্যা কাগজ-কলম নিয়ে কতগুলো পংক্তি লিখে ফেলেন। এই পংক্তিগুলোর মধ্যে প্রকৃতি ও শিল্পের প্রতি কথকের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। ফুল ফোটানোর ঘটনা কথকের জীবনে সার্থকতার বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। পংক্তিগুলো নিম্নরূপ:

> ফুলফোটানো সহজ কথা নয়
> শূন্য থেকে মূর্ত করা সৃষ্টির বিস্ময়
> পারে সে জন ভেতর থেকে ফোটার স্বভাব যার
> ফালতু লোকের ভাগ্যে থাকে বন্ধ্যা অহঙ্কার।[৩৪]

উদ্ভিদজগতের বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, গাছের প্রাণ আছে। সেই প্রাণের সাথে মানুষের প্রাণের সংযোগ সাধন সম্ভব, যদি মানুষ বৃক্ষের চেতনার সাথে সমঝোতা করে নিতে পারে। লেখকের মতে আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গাছপালা মানুষের চেতনায় 'ইনডিভিজুয়েল' বা ব্যক্তি হিসেবে স্থান করে নিতে পারে। কথক তাই প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছেন:

> আমি স্বীকার করি গাছের প্রাণ আছে, সে প্রাণের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-অনুভূতি সবটাই মানুষের প্রাণে তরঙ্গিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তার আগে মনুষ্যচেতনার তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে বৃক্ষ চেতনার তরঙ্গ প্রবাহের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নিতে হয়। সেটি খুব সহজ কাজ নয়। বৃক্ষ যার-তার কাছে তার আসল স্বরূপ উন্মোচন করে না।[৩৫]

পুষ্প এবং বৃক্ষের বর্ণনা শেষে ঔপন্যাসিক বিহঙ্গের সাথে তাঁর হৃদ্যতার বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছেন। কথকের পালিত পুত্র সুশীল নীলক্ষেতের চিড়িয়াঅলার কাছ থেকে একটি ঝুটি

শালিকের বাচ্চা কিনে নিয়ে আসায় পাখি নিয়ে কথকের জীবনের বিভিন্ন অতীত স্মৃতি ভেসে উঠেছে। তিনি ছোটবেলায় একটি শালিক পুষেছিলেন। সেটা খুব পোষও মেনেছিল। শালিকটির মৃত্যু সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এ পাখিটা যখন মারা যায় শোকে এক সপ্তাহ আমি ঘুমোতে পারিনি। এ পাখিটিকে আমি মরা মানুষকে যেমন কবর দেয়া হয়, তেমনি কবর দিয়েছিলাম। অনেকদিন একা একা পাখিটির কবরের পাশে বসে থাকতাম। পাখিটির মৃত্যুই হল আমার শিশু বয়সের প্রথম শোক।'[৩৬] এ ঘটনার মধ্য দিয়ে পাখির প্রতি কথকের শৈশবীয় গভীর ভালবাসাই অভিব্যক্ত হয়েছে। তাই সুশীল একটি ঝুটি শালিক কিনে আনলে তিনি মনে করেছেন তাঁর শৈশবের মরে যাওয়া শালিকটি আবার প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে থাকার সময় কথক একটি পাখি পোষেন। সে সময় তিনি অনেকটা বাউলের জীবন কাটাতেন। তাঁর মাথায় সে সময় ছিল দীর্ঘ বাবরি চুল। পাখিটিকে তিনি সবসময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। পাখিটি সম্পর্কে কথক বলেছেন:

> পাখিটি দিনে দিনে আমার সত্তার অংশ হয়ে উঠেছিল। পাখিটি ছাড়া কিছুতেই আমার চলত না।[৩৭]

অথচ এই পাখিটিও বিড়ালের থাবায় প্রাণ হারায়। শৈশবে পোষা পাখির শোক এবং ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে পুনর্বার পাখির শোক তাঁকে পাখি পোষার আগ্রহ কমিয়ে দেয়। শৈশবে পোষা পাখির মৃত্যু সম্পর্কে লেখক অন্যত্র বলেছেন:

> তখন শালিকের ব্যথাটা এতো লাগছিলো, অনেক পাখি পুষলাম, কিন্তু শালিকের ব্যথাটার ঐ জায়গাটা ভরেনি, জীবনের প্রথম মৃত্যু আমার।[৩৮]

সুশীলের কেনা পাখির সাথে ধীরে ধীরে কথকের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। পাখিটিকে তিনি 'অপূর্ব সুন্দর' পাখি বলে অভিহিত করেছেন। পাখিটির বন্দীদশা সম্পর্কে কথক বলেছেন, 'পাখিটির সঙ্গে জোর করে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে আমার ভেতরেও একটা নাম না জানা পাখি অবিরাম পাখা ঝাপটাচ্ছে। আসল ব্যাপার ভুলে থাকি বলে টের পাইনে। চিনতে পারো, নাকি রে মন বুঝতে পারে নাকি, তোমার পিঞ্জিরায় থাকে অচেনা এক পাখি।'[৩৯] পাখিটি কথকের হৃদয় অধিকার করে বসে। কিন্তু একদিন পাখিটির গায়ে সুশীল রঙ মাখাতে গেলে অসতর্ক মুহূর্তে পাখিটি লম্বা উড়াল দিয়ে হারিয়ে গেল। কথক মনে নতুন করে ব্যথা পেলেন। পাখিটি এরপর মাঝে মাঝে খাবার তাগিদে ফিরে আসত। কথক ছাঁদে খাবার ছড়িয়ে দিতেন, এই সুযোগে ছাঁদে ছড়ানো খাবার খেতে রাজঘুঘু, কাক, বুলবুলি, দোয়েল আসতে শুর" করে। বুলবুলির গান শুনে কথক বলেছেন:

> আমি পাখিপুত্রটির কাছে অনেক ঋণে ঋণী। সে আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতরো করেছে। পাখির কণ্ঠের বৈচিত্র্য শুনে অনুভব করতে পারি, এখনো মানুষের ভাষা কতদূর সীমিত। কত কিছুই আমি জানতাম না।[৪০]

এরপর তাঁর ছাঁদে গাঙশালিক, হলদে পাখি, চড়ুই ঝাকে ঝাকে আসতে থাকে। গাঙশালিক দেখে তাঁর উদাস-নয়না সুন্দরী নারীর কথা মনে এসেছে। কাক সম্পর্কে কথক সংস্কৃতের শেণ্ঢাকের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'কাক চেষ্টায় বক ধ্যানং। কাকের মতো চেষ্টা করতে

হবে, বকের মতো ধ্যান করতে হবে।'[৪১] ছাঁদের ওপর একটি দাঁড়কাক আসায় কাকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দাঁড়কাক এবং শহরের কাক সম্পর্কে কথক বলেছেন:

> আমি তার দিকে রুটির টুকরো ছুড়ে দিলাম। শহরের কাকেরা সে টুকরোগুলো তার মুখের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেললো। আমার মনে বড় লাগল। এভাবেই শহরের মানুষেরা গ্রামের মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে থাকে। তার পরদিন একটার জায়গায় দুটো দাঁড়কাক এল। তারপর থেকে এখানে সেখানে নানা জায়গায় দাঁড়কাক দেখতে লাগলাম। আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। গ্রামে কি ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে, নইলে শহরে দলে দলে দাঁড়কাক এমনভাবে ছুটে আসবে কেন? নদী ভাঙা মানুষ যেমন আসে, দুর্ভিক্ষের থাবা থেকে জান বাঁচার (বাঁচানোর) জন্য হাভাতে মানুষ যেমন আসে, তেমনি শহরে দলে দলে দাঁড়কাক আসছে, তার কারণ কী? [৪২]

দাঁড়কাকের প্রসঙ্গে লেখক গ্রামীণ সমাজজীবনের ভাঙনের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাখিদের প্রাসঙ্গিকতায় পুঁজিবাদের উত্থান বিষয়ে এমন সরস বর্ণনা বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল। প্রকৃতির সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে লেখক এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এরপর দেখা যায় দাঁড়কাক আর পাতিকাকের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। কাকের জগতে হিংস্রতা এবং মাস্তানি শুরু হয়। কথক বলেছেন যে, 'এক সময় হয়ত এমনও হতে পারে দাঁড়কাকেরা এই শহর থেকে পাঁতিকাকদের তাড়িয়ে দেবে। এখন কথা হল কাকের রাজ্যে বিপর্যয়ের যে লক্ষণগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, অন্যেরা কি সেভাবে দেখছে?'[৪৩] কাকের প্রতীকায়নে আহমদ ছফা মানব সমাজের উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে বিদ্যমান বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানির চিত্র তুলে ধরেছেন। পাখির জগতে হিংসা, হানাহানি, জাতিবৈরিতা বা শ্রেণিসংগ্রাম দেখে কথক বলেছেন:

> মাটির মানুষের জগতে হিংস্রতা এবং হানাহানি দেখে আকাশের পাখির জগতে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানেও হিংস্রতা এবং জাতি বৈরিতার প্রকোপ দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং, মানষের মতো কর্তব্য পালন করার জন্য আমার মানুষের কাছে ফিরে না গিয়ে উপায় কী? আমি বৃক্ষ নয়, পাখি নয় মানুষ। ভালো হোক, মন্দ হোক, আনন্দের হোক, বেদনার হোক আমাকে মানুষের মতো মানুষের সমাজে মনুষ্যজীবনই যাপন করতে হবে। মনুষ্যলীলার করুণ রঙ্গভূমিতে আমাকে নেমে আসতে হবে। তথাপি আমার জীবন আমি একেবারে অর্থহীন মনে করিনি। আমার প্রাণে পুষ্পের আঘ্রাণ লেগেছে। জীবনের একেবারে মধ্যবিন্দুতে বৃক্ষজীবনের চলা অচলার ছন্দদোলা গভীরভাবে বেজেছে, বিহঙ্গ জীবনের গতিমান স্পন্দন বারংবার আমার চিন্তা-চেতনাকে অসীমের অভিমুখে ধাবমান করেছে। এই পুষ্প, এই বৃক্ষ, তরুলতা, এই বিহঙ্গ আমার জীবন এমন কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে, আমার মধ্যে কোনো একাকীত্ব, কোনো বিচ্ছিন্নতা আমি অনুভব করতে পারিনে। সকলে আমার মধ্যে আছে। আমি সকলের মধ্যে রয়েছি। ... একমাত্র অন্যকে মুক্ত করেই মানুষ নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারে।[৪৪]

পাখির জগতে হিংস্রতা, হানাহানি দেখে কথকের পাখির জগৎ ছেড়ে মনুষ্যজীবনের রঙ্গালয়ে মনুষ্য কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ফিরে আসতে চাওয়াতে এই উপন্যাসকে ভিন্নধর্মী উপন্যাস বলে মনে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মর্তব্য: 'এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন